খণ্ড ১১, সংখ্যা ১২ | ভাবনগর | ডিসেম্বর ২০১৯
Vol. 11, No. 12 | BHĀBANAGARA | December 2019

মাইজভাণ্ডারের বাণী

মাসাহিকো তোগাওয়া

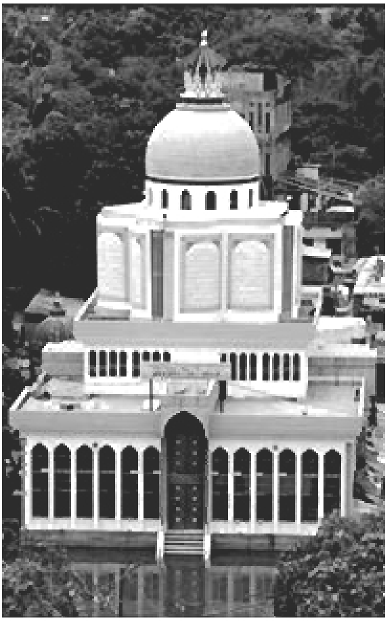

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর মাজার শরীফ

The Message of Maizbhandar

Masahiko Togawa

Abstract

Masahiko Togawa describes herewith how he has acquired his realization about the fact of the anthropologists' researches by analyzing his own experiences of witnessing the Maizbhandar carnival at the remote rural Bangladesh. Togawa states that the local folks have much more knowledge of their own anthropological aspects much more than those of the anthropologists. He met several rural elderly persons who can elaborately explain the writings of the anthropologists. Though the previous anthropologists' target was to work on marginalized communities, the contemporary anthropologists of the globalized context have little scope to differentiate between the observer and the observed. An authorized researcher can reach the cognitive horizon through interaction between the recognition subject and the recognized subject. This characteristic is known as the Phenomenological Reality in the oriental philosophy. This phenomenological reality is found in the field study of the anthropologists who conduct their field works across the rural locale. Every recognition subject and the recognized subject get in interaction through their recognition act with the subjectivity. Such coalescence is the real facet of the field's society living in inter-subjective interaction. The above conclusion Togawa brought in by explaining his journey into the world of Maizbhandar School introduced by a Bangali *sufi* Hazrat Syed Ahmad Ullah (1826-1906). The author got surprised to see his citation in the only academic book on Maizbhandar, Selim Jahangir and published by Bangla Academy in 1999. However, Selim is quite unknown to Togawa and until 1999 Togawa wrote nothing about Maizbhandar but just had started expressing his interest about this popular Islamic culture developed in Bangladesh. In fact, he casually had passed a few comments about Maizbhandar to Mr. Sukumar Biswas, a Bangla Academy official. And, listening to Sukumar, Selim Jahangir noted down and used the note as citation of Togawa. The author felt a little embarrassed but took the incident as learning. Togawa first visited Maizbhandar village, in Fatikchari Upazila of Chattogram in 1994.

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে মাইজভাণ্ডার তরিকার মাজার আছে। আমি যখন সেখানে যাই, মাজারের খাদেম আবুল কালাম আমাকে ঘুরিয়ে মাজারটা দেখায় আর যখন আমি বলি যে—'আমি জাপান থেকে এসেছি' তখন সে বলে—

> এই তরিকার বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। তোমার দেশের লোকও এই মাইজভাণ্ডার তরিকার বাণী দ্বারা মুগ্ধ হয়ে বই লিখেছে।

'মাইজভাণ্ডার' হলো বাংলাদেশের অন্যতম সূফী তরিকা। প্রতিষ্ঠাতার জন্ম বঙ্গদেশে, এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গান আর আল্লাহ্‌র নামে জিকির, বাংলা লোকসংস্কৃতিকে ভিত্তি করে সাধনা, তরিকা গড়ে উঠেছে। মূলত পূর্ব বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে গ্রাম-গঞ্জের লোকদের মধ্যে এই সূফী তরিকা প্রচারলাভ করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মতো বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মশিক্ষা ইসলাম সাধক পীরের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল। সাধকের শিক্ষার সাধন পরম্পরা খুবই আকর্ষণীয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য দ্বার খোলা আছে।

দক্ষিণ এশিয়ার ইসলাম ধর্মের মূলত ৪টা তরিকা হলো—১. সোহরাওয়ারদি, ২. চিশতি, ৩. কাদেরি, এবং ৪. নকশবন্দি। বাংলাদেশের এই চার তরিকা প্রাচীনকাল থেকে জনগণের মধ্যে প্রচলিত। দক্ষিণ এশিয়ার এই চার তরিকা প্রায় সবই দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে মধ্য প্রাচ্য দেশগুলিতে [তুর্কি-আরব] শুরু হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সমাজে একটা ধারণা আছে যে, হজরত মহম্মদ (সা.)-এর জন্মস্থান মধ্য প্রাচ্যে সৃষ্ট তরিকা হলো সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও খাঁটি। কিন্তু মাইজভাণ্ডারের জন্ম বঙ্গদেশে। মাইজভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা হজরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ [১৮২৬-১৯০৬]-র জন্ম চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাইজভাণ্ডার গ্রামে।

মাইজভাণ্ডার নামকরণ হয়েছে প্রতিষ্ঠাতার গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত মাইজভাণ্ডার গ্রাম থেকে। চট্টগ্রাম গ্রামাঞ্চলের মাঝখানে বর্তমানে প্রতিষ্ঠাতার কবরস্থান বা মাজারও তৈরি করা হয়েছে। তার পাশে তাঁর আত্মীয় এবং শিষ্যদেরও অগণিত মাজার সংলগ্ন আছে। উৎসবের দিনে সারা বাংলাদেশ থেকে ভক্তরা

উরসের সময় সুসজ্জিত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর মাজার শরীফ

উরসের সময় সুসজ্জিত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর মাজার প্রাঙ্গণে জনসমাগম

উরসের সময় সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে জনসমাগম

আসেন বলে মাজারের আশেপাশে অনেক থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়ার জন্য হোটেল তৈরি হয়েছে, আর এখন সেটা বিরাট তীর্থ প্রতিষ্ঠানে রূপ গ্রহণ করেছে।

বিশেষ করে হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ ও তাঁর বংশধর সাধকদের উরসের সময় সারা বাংলাদেশ থেকে বাস বা গাড়িতে করে তীর্থযাত্রীর দল এই সুদূর গ্রামে আসেন। উরসের সময় অনেক দোকানপাট বসে, এমনকি সার্কাসের দলও প্যান্ডেল খাটিয়ে তাদের খেলা দেখায়, আর এই ছোট্ট নির্জন গ্রাম বিরাট উৎসবে কোলাহলময় হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকদের তীব্র উৎসাহ আর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সকল কিছু জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এখন এই তরিকার শিষ্য সংখ্যা বেড়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে। এখন বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত একটা সুফী তরিকা রূপে পরিগণিত হয়েছে।

মাইজভাণ্ডার তরিকা বাংলার লৌকিক ইসলাম ধর্মকে হুবহু রূপায়িত করেছে। তাই এই বিষয়ে আমার খুব আগ্রহ হয়েছিল। আমি ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মাইজভাণ্ডার তরিকার মূল মাজার [তথা সৈয়দ আহমদ উল্লাহর মাজার]–এ যাই, এবং তারপর থেকে সুযোগ পেলে মাইজভাণ্ডারের প্রত্যেকটা শাখাতেও গিয়েছি।

এইভাবে মাজারের অনুষ্ঠানে আসা–যাওয়ার মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ উল্লাহর বংশধরদের মধ্যে একজন সাধক আমাকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ধর্মীয় অনুষ্ঠান বায়াত নিতে বললেন।

সৈয়দ গোলামুর রহমানের মাইজভাণ্ডারীর মাজার প্রাঙ্গণ

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর মাজার প্রাঙ্গণ

চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারীর মাজার প্রাঙ্গণের প্রধান কয়েকটি মাজার শরীফ

সেখানে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে চট্টগ্রামের মূল মাজারে যখন আমার যাই, ঠিক তখন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর উরস উপলক্ষ্যে বিরাট অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে ভক্তদের খুব ভিড় ছিল। প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ উল্লাহর মাজারের সামনে এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে ২ নম্বরে বিখ্যাত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী মাজারের সামনেও প্রচণ্ড ভিড়ে যেন কেলেঙ্কারি কাণ্ড ছিল। লোকজনের হট্টগোলে আর উত্তেজনায় গমগম করা পরিবেশের মধ্যে ধীরে সুস্থে কথা শোনার মতো অবস্থা ছিল না। তখন কিছুটা দূরে ৩ নম্বরে জনপ্রিয় সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী মাজারের খাদেমের কাছে গিয়ে কিছু কথা, বিশেষ করে মাইজভাণ্ডারের বিস্তারিত ইতিহাস বিষয়ে জানতে চাইলাম।

'এই তরিকা নিয়ে গবেষণার জন্য আগে কি কোনও বিদেশী এসেছেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী মাজারের খাদেম কালাম। তিনি আমাকে বলেন—

> সম্প্রতি বাংলাদেশের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র বাংলা একাডেমি থেকে এই তরিকার বিষয়বস্তু নিয়ে একটি গবেষণামূলকগ্রন্থ বেরিয়েছে। সেই বইয়ে একজন জাপানী বিশেষজ্ঞের উক্তির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

তাঁর কাছ থেকে এই কথা শোনার পর আমার ভীষণ কৌতূহল হলো। কারণ এই তরিকা নিয়ে জাপানে কোনও গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা ছিল না। বিশেষ করে বিষয়টা নিয়ে কোনও ইংরেজি বইও সেই পর্যন্ত আমার দেখা হয় নি। তরিকার শিক্ষা

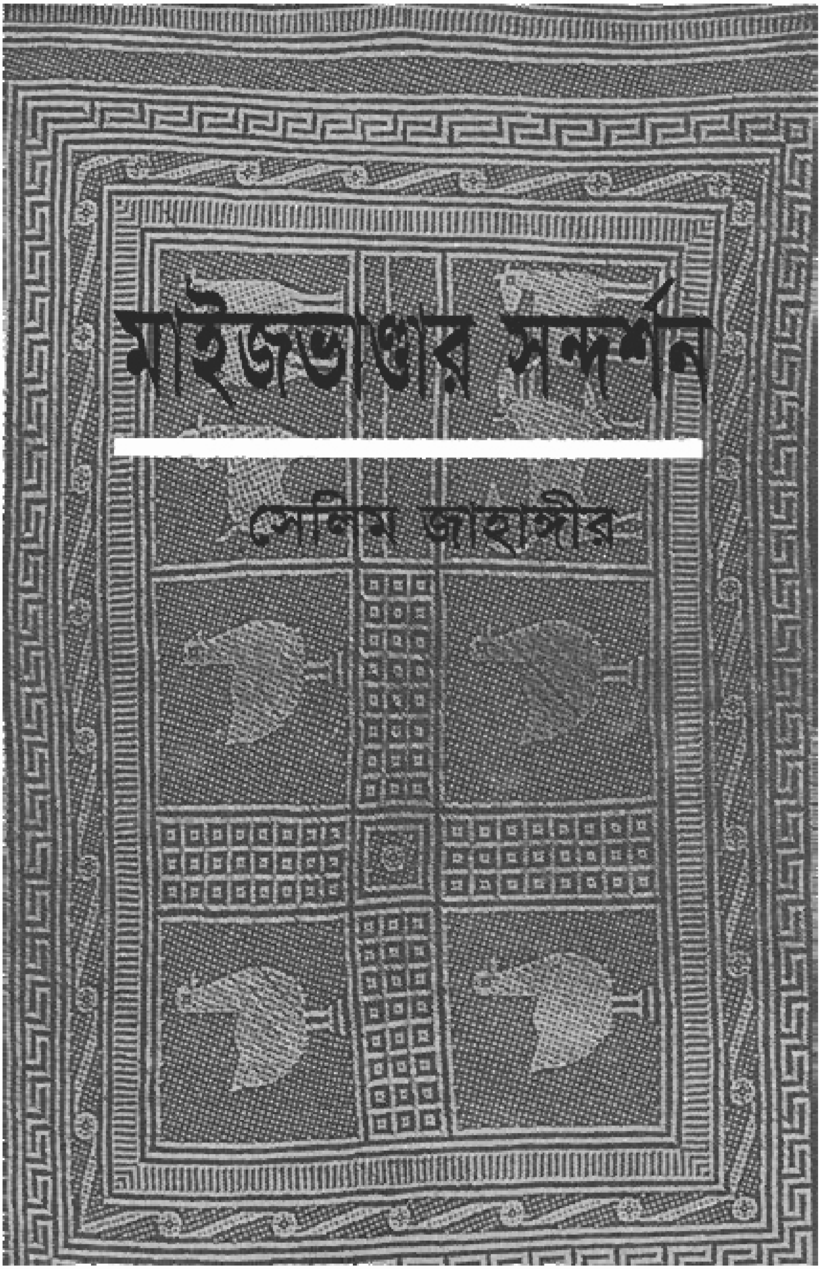

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সেলিম জাহাঙ্গীর রচিত মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন শীর্ষক গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র, প্রকাশকাল : ১৯৯৯

বিষয়ে কয়েকটা বাংলা বই ছিল মাত্র। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি বোঝার জন্য এই ধর্মীয় তরিকা সম্বন্ধে জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে কোনও জাপানী তো দূরের কথা, পাশ্চাত্য গবেষকও এই তরিকা নিয়ে কাজ করেন নি বা তুলে ধরেন নি।

কিন্তু সাধারণ বাঙালীরা সবাই জানেন যে, মাইজভাণ্ডার হলো লোকায়ত ইসলামের একটি সুফী তরিকা। সেটা কোনও আকর্ষণীয় বস্তু বা বিরাট কিছু নয়, একদম সাধারণ সর্বজনিত লৌকিক তরিকা। তাই হয়ত কেউ সেটাকে গবেষণার বিষয় হিসাবে গণ্য করেন নি। তাই মনে হলো, যে শিক্ষামূলক গবেষণার দিক থেকে বিষয়টায় হয়ত একদমই হাত লাগানো হয় নি। কিন্তু খাদেম কালাম বলছিলেন যে, সেখানে একজন জাপানী এসেছেন, আর তাঁর কথা নাকি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বইয়েও উল্লেখ করা আছে! কিন্তু সেই জাপানী কে? আর কি উদ্দেশ্যেই বা সেখানে গিয়েছিলেন? আমার খুব জানতে ইচ্ছা হলো।

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী মাজারের খাদেম কালাম আমাকে আরও বললেন—

> এই বইয়ে মাইজভাণ্ডারের বাণী/শিক্ষা কতটা চমৎকার সেই গুরুত্ব আপনারা জাপানীরাও স্বীকার করে বইতে লিখেছেন। সুতরাং এই তরিকার বাণী এখন শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত।

একথা শোনার পর আমি কালামকে অনুরোধ করে বইটি ভিতর থেকে আনালাম। দেখলাম, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বইটি একজন বাংলাদেশী গবেষক সেলিম জাহাঙ্গীরের লেখা, বইয়ের নাম—*মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন*। বইটির মুখবন্ধ পড়ে

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রবেশ তোরণ

মাশাহিকো তোগাওয়া এর একান্ত গবেষণামুখী দৃষ্টিভঙ্গীজাত বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে তাঁর আকর্ষণের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য।

ড. মাসাহিকো তোগাওয়া গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ভারতের 'ধর্মীয়–সংস্কৃতি' বিষয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর তাত্ত্বিক গবেষণার পর বিগত প্রায় বছর খানেক ধরে বাংলাদেশের দরগাহ এবং মাযারের উপর গবেষণা করে চলেছেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে, একান্তে–নিরবে নিভৃতে।

একজন সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বনামধন্য, প্রতিশ্রুতিশীল আন্তর্জাতিক গবেষক তাঁর সুনির্দিষ্ট গবেষণার বিষয় হিসেবেই বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রায় ".এগুলো দরগাহ ও মাযার পর্যবেক্ষণের পর কোনোরূপ পূর্বধারণা বা সূত্র ছাড়াই তুলনামূলক বিচারে মাইজভাণ্ডার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন এর স্বতন্ত্র মূল্যও অবশ্য স্বীকার্য। ড. মাশাহিকোর ভাষায়—

আমি বাংলাদেশের বড় ছোট প্রায় সবগুলো দরগাহ মাযার পর্যবেক্ষণ করেছি খুবই ঘনিষ্টভাবে। এর মধ্যে আমাকে বেশি করে আকর্ষণ করেছে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ। মাইজভাণ্ডারের সামগ্রিক বিশেষত্ব আমার মনে দাগ কেটেছে বিশেষভাবে।

[বাংলা একাডেমীর গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর সুকুমার বিশ্বাস এর সাথে ডক্টর মাশাহিকো তোগাওয়ার একান্ত আলাপচারিতা।]

মাইজভাণ্ডার বিষয়ে ফিনল্যাণ্ড, জাপান ও জার্মানীর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ গবেষণা এবং গবেষণার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার সমাচারের পর অতি সম্প্রতি মাইজভাণ্ডার বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকর্মের একটি তথ্যও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

নৃতাত্ত্বিক গবেষক, ব্যক্তিগত জীবনে ইউরোপিয়ান কমিশন–এন. জি. ও ডায়ালগ প্রজেক্টের যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর মঞ্জুরুল মান্নান ব্যক্তিগতভাবে ভক্তের দৃষ্টিতে মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফকে দেখে ও উপলব্ধি করে ভক্তবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামিক নৃতত্ত্বের সমন্বয়সাধন করে মাইজভাণ্ডারি সুফিসাধকদের, বিশেষত শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারিকে কেন্দ্র করে তাঁর গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

"পীর ও প্রতীকী প্রতিফলন" (Semiotic Presence) শিরোনামে তাঁর এই মৌলিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় সমগ্রভাবে ধর্মীয় নৃতত্ত্ব এবং সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামিক নৃতত্ত্বে মাইজভাণ্ডারকে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সুফিদের জাহেরি (প্রকাশ্য) এবং বাতেনি (গুপ্ত) রূপের একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত ব্যাখ্যা থাকে। একজন যথার্থ সুফিসাধক একই সাথে জাহেরি ও বাতেনি এই দুই অবস্থানে বিরাজ করেন। ড. মঞ্জুরুল মান্নানের গবেষণার বিষয় মূলত বাতেনি তথা গুপ্ত রূপ ও অবস্থানের একটা কাঠামোগত রূপ রেখা আবিষ্কার। মাইজভাণ্ডার কেন্দ্রিক এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চতর গবেষণা সমগ্রভাবে মাইজভাণ্ডার গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব

শত বছরের ইতিহাসকে ধারণ ও লালন করে মূলত চট্টগ্রাম অঞ্চলের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে মাইজভাণ্ডার দরবারশরিফের যে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্য ও অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তা ইতোমধ্যে সুধী সমাজ, অনুসন্ধিৎসুজন এবং গবেষকমহলে কিছু কিছু

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন শীর্ষক গ্রন্থে মুদ্রিত গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়ার মন্তব্য সম্বলিত পৃষ্ঠা

আরও অবাক হতে হলো! কারণ, বইটিতে যে জাপানী গবেষকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা আমারই কথা। আসলে, সেলিম জাহাঙ্গীর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ জমা দিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে বইটি লেখা হয়েছে। এরমধ্যে মাইজভাণ্ডারী তরিকার কাজকর্ম, প্রচার ও ইতিহাস ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। বলা যেতে পারে যে, মাইজভাণ্ডার বিষয়ে এটিই গবেষণামূলক প্রথম একাডেমিক বই। বইটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত গবেষণাকেন্দ্র বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলে বইটির বিষয়বস্তুও নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য ছিল। বইটিতে সেলিম জাহাঙ্গীর মাইজভাণ্ডার গবেষণার তাৎপর্য সম্বন্ধে, বিভিন্ন তরিকা সম্বন্ধে বর্ণিত গবেষকদের মতামত ও সবশেষে লিখেছিলেন, 'জাপানী গবেষক তোশাওয়া মাসাহিকোর মতে, ...'

আমি বেশ বিস্মিত হলাম। কারণ, এই সেলিম জাহাঙ্গীরকে তো আমি চিনি না। তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ কোথাও দেখা হয়েছিল বা পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। এরকম মন্তব্য আমি কোথাও কখনো করেছি কিনা তাও মনে করতে পারি না। তাই, প্রথমে আমি নিজেই হা হয়ে গেলাম।

উদ্ধৃতি অংশের ব্যাখ্যা এরকম ছিল, মাইজভাণ্ডার তরিকা বাংলা সংস্কৃতিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ। আমার তখন মনে পড়লো যে, ঢাকার বন্ধুর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে প্রায় আলোচনা করতাম। কিন্তু তখনও বিষয়টা নিয়ে কোনো প্রবন্ধ লিখিনি, কোথাও বক্তৃতাও দিইনি। বন্ধুর সঙ্গে গল্পের ছলে হয়তো মাইজভাণ্ডারি তরিকা ও তার গানের সংস্কৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম।

উরসের সময় সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে জনসমাগম

[illegible]

[illegible]

পরে আমি মনে করতে পারি, আমার পরিচিত বাংলা একাডেমির একজন কর্মকর্তা সুকুমার বিশ্বাসের সাথে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। এবার আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। আসলে, একসময় সেলিম জাহাঙ্গীর বাংলা একাডেমিতে গবেষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। মাইজভাণ্ডার তরিকা নিয়ে আমারই জাপানী গবেষক আছেন শুনে তিনি নাকি সুকুমারদার কাছে তাঁর সম্বন্ধে জানতে এসেছিলেন। তখন সুকুমার বিশ্বাস আমার হয়ে আমার বক্তব্য, যতটুকু ওনার স্মৃতিতে ছিল, সেটা বলেছিলেন। আর সেলিম জাহাঙ্গীর সে বিষয়ে নোট করে নিয়ে তাঁর বইতে লিখেছিলেন।

বাংলা একাডেমি বইটি ছেপেছে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ আমি মাইজভাণ্ডারে যেতে শুরু করেছি, ঠিক তার ১ বছরের মধ্যে। সুতরাং বইয়ের উদ্ধৃত অংশ যে আমারই বক্তব্য ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমার অজান্তে আমার মন্তব্য বা বক্তব্য কোনও বইতে ছেপেছে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তথ্যের দিক থেকে যেহেতু কোনও ভুল নেই, সুতরাং আমার তাতে কোনও আপত্তিবোধ নেই। কিন্তু তবুও কেন আমি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়েছে।

অধ্যাপক মাসাহিকো তোগাওয়া ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনগণের সম্মুখে তাঁর রচিত বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করছেন

হজরত গাউছুল আজম শাহ্‌ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ আহ্‌মদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর

জীবনী ও কেরামত

সঙ্কলন ও প্রকাশনায়ঃ—

মৌলানা শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

মাইজভাণ্ডারী

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত বিষয়ক একটি গ্রন্থের আখ্যাপত্র

উরসের সময় বর্ণিল আলোক শোভিত মাইজভাণ্ডারীর মাজার প্রাঙ্গণ

মাইজভাণ্ডারীর মাজার প্রাঙ্গণে গানের আসর

সম্প্রতি নৃতত্ত্বাত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নৃতত্ত্ব গবেষকদের চেয়ে স্থানীয় লোকেরা নৃতত্ত্ব বিষয়ে অনেক বেশি কিছু জানেন।গ্রামের বয়স্কদের পুরনো দিনের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি লোকসংস্কৃতিবিদের বই বার করে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এরকমও হয়েছে।

যে এলাকায় নৃতত্ত্ববিদ বা নৃবিজ্ঞানীরা নতুন কিছু পাবার জন্য যান, সেখানে স্থানীয় মানুষরা নৃতত্ত্ববিদ বা নৃবিজ্ঞানীদের বই থেকে অনেককিছু জ্ঞান অর্জন করে।

নৃতত্ত্ববিদরা গবেষণা করার আগে তারাই গবেষকদের অনেককিছু শিখিয়ে দিতে পারে। এরকম ব্যাপার এখন ঘটছে।

আগের নৃতত্ত্ববিদ বা নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তবর্তী সমাজ, Societies in the frontier, অর্থাৎ পাহাড়ি এলাকার সমাজ বা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সমাজ। কিন্তু আজকালকার বিশ্বায়নের যুগে পর্যবেক্ষক the observer ও পর্যবেক্ষিত the observed এদের মধ্যে স্পষ্ট ভেদ যেন এখন আর নেই। অর্থাৎ স্বীকৃতি ব্যক্তি the recognition subject স্বীকৃত ব্যক্তি recognized subject এই দুইয়ের মধ্যে মিথ ক্রিয়া হলে তবেই অনুভূতির দিগন্তে Cognitive Horizon-এ পৌঁছতে পারবে। এই বিষয়টা প্রাচ্য দর্শনের মধ্যে 'Phenomenological Reality' নামে পরিচিত। এই অবস্থা নৃতত্ত্ববিদ বা নৃবিজ্ঞানীদের গ্রামাঞ্চলে গবেষণার কাজের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।

স্বীকৃতি ব্যক্তি আর স্বীকৃত ব্যক্তিরমধ্যে প্রত্যেকের recognition act with subjectivity-র মাধ্যমে পরস্পর মিলন ঘটছে। সেই মিথস্ক্রিয়া Intersubjective Interaction-এর স্থান হচ্ছে গবেষকদের field সমাজের আসল রূপ।

এইভাবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মাইজভাণ্ডারের উৎসব দেখার মাধ্যমে নৃতত্ত্ববিদ বা নৃবিজ্ঞানীর গবেষণা কাজের আসল সত্য যেন বুঝতে পেরেছি।

গ্রন্থপঞ্জি

সেলিম জাহাঙ্গীর, *মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯

তথ্যসূত্র : এই প্রবন্ধটি লেখক মাসাহিকো তোগাওয়া কর্তৃক (Chiikikenkyu Spectrum, no.4, ASAFAS, Kyoto University, October, 2001, pp. 34-38.) নতুন করে জাপানি থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।